দ্য উইচার

দ্য লাস্ট উইশ

আন্দ্রেই স্যাপকোভস্কি

অনুবাদ

আশরাফুল সুমন

অনুবাদকের কথা

চার বছর! হ্যাঁ, চার-চারটা বছর ধরে এই বইয়ের শব্দগুলো আমার মগজ এবং পিসির হার্ডডিস্ক জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিলবিল করতে থাকা শব্দগুলো মাঝেমধ্যে জট পাকাতো, নিজেরা নিজেদের মাঝে ঝগড়া লাগিয়ে দিতো, 'ক্যান্সেল কালচার'-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরস্পরকে 'ক্যান্সেল' করতে চাইতো, নিজেকে অপরজনের চাইতে উত্তম প্রমাণ করার জন্য হেঁড়ে গলায় চিৎকার-চেঁচামেচি করে বলতো, 'মি লর্ড, আমি এই হতচ্ছাড়ার চাইতে অধিকতর সুশ্রী এবং যোগ্য। আপনি নিশ্চিন্তে তার স্থানে আমাকে ব্যবহার করতে পারেন।' ফলাফল হলো লেখকের ফাঁসিকাষ্ঠে নিরীহ শব্দের শিরশ্ছেদ, এরপর তার স্থলে নতুন শব্দের স্থলাভিষিক্তকরণ। আর তারপর সমস্ত লাজ-শরমের মাথা খেয়ে আশাইয়ের লোহিত-যাজিকাদের ডেকে এনে নিজ হাতে মাথা কেটে নেওয়া শব্দের পুনর্জাগরণ। তারপর আবারো বেহায়ার মতো শিরশ্ছেদ। আবারো লোহিত-যাজিকার আগমন।

এই বইটা আমি পড়েছিলাম ২০১৮ সালে। *দ্য লাস্ট উইশ* আসলে *দ্য উইচার* সিরিজের মূল সাগার পূর্বে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা নিয়ে লেখা ছোট গল্পের সংকলন। এর পরের বই *সোর্ড অব ডেস্টিনি*-ও তাই। মূল সাগা শুরু হয় তৃতীয় বই *ব্লাড অব এলভস* থেকে। আপনাদের কাছ থেকে সাড়া পেলে একে একে সবগুলোই আসবে। আমার এখনো মনে আছে এই বইয়ের *দ্য লাস্ট উইশ* নামের গল্পটি পড়ার সময় আমি কতটা রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার এক মামা তখন সৌদি থেকে দেশে আসছিলেন, তাকে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা ছিলো। আর আমি বেহায়ার মতো বাসায় বসে লাস্ট উইশ পড়ছি। নির্লজ্জ আমি গল্প শেষ করে তবেই গিয়েছিলাম; সে এক বিশাল কাহিনি।

তখন সিদ্ধান্ত নেই এই বইটা অনুবাদ করবো। কিন্তু তখন তো ফ্যান্টাসি অনুবাদ সেভাবে হতো না। ফ্যান্টাসির বাজারও তেমন ছিলো না। হুট করে অনুবাদ করে ফেললে যদি মানুষ পছন্দ না করে? এই চিন্তা থেকে পরিকল্পনা করলাম যে প্রথমে বইয়ের প্রধান চরিত্র রিভিয়ান গেরাল্টকে মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। সেই ভাবনা থেকেই ঐ বছর অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে এই বইয়ের প্রথম গল্প *দ্য উইচার*-এর অনুবাদ করে ফেললাম *পুরোনো প্রাসাদের বিভীষিকা* নামে। প্রকাশিত হলো কোলকাতা থেকে বের হওয়া পূজার কোনো সংখ্যায়। এরপর আমার

টাইমলাইন আর কয়েকটা গ্রুপে। মানুষ চরিত্রটাকে বেশ পছন্দ করলো, সাথে গল্প আর অনুবাদও। তবে আমি আরো পাঠক তৈরি করতে চাচ্ছিলাম। তাই বইয়ের দ্বিতীয় গল্প *সত্যের ছোঁয়া*-ও অনুবাদ করে অনলাইনে প্রকাশ করে দিলাম ২০১৯-এর শুরুর দিকে। তারপর উইচারের অনুবাদের বেশ চাহিদা তৈরি হতে দেখলাম। ফলে বাকি গল্পগুলোও অনুবাদের কাজ শুরু করে দিলাম।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে অন্যধারা থেকে অফিসিয়াল ঘোষণাও দিয়েছিলাম, কিন্তু করোনার কারণে আর বের করা হয়নি তখন। এরপর নানান অনাকাঙ্ক্ষিত বাধা-বিপত্তির কারণে বইটা আরো দুই বছর ছাপাখানার দুয়ারে পা রাখতে পারেনি। এখন অবশেষে বইটা বের হচ্ছে...এই চিন্তাটা একাই আমার ভেতর স্বস্তির নহর বইয়ে দিচ্ছে।

বইটা আমার জন্য প্যাশন প্রজেক্ট আসলে। এর আগে *ম্যাগনাস চেইস: দ্য সোর্ড অব সামার* এবং *এ গেম অব থ্রোনস*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সহ-অনুবাদক হিসেবে কাজ করলেও আমার কোনো একক অনুবাদ ছিলো না–আর এ নিয়ে আমার মনকুঞ্জে খানিকটা অপ্রাপ্তির ছায়াও বিরাজ করতো সব সময়। এটাই আমার প্রথম একক অনুবাদ, আর হয়তো সে কারণেই এর প্রতিটা গল্প–কী বলছি আমি, প্রতিটা শব্দ–উপভোগ করেছি (আর সে কারণেই হয়তো বেশি বেশি বকছি)। আমার মনে হয় প্রতিটা মৌলিক লেখকেরই জীবনে একবার হলেও পুরো একটা বই একা অনুবাদ করার স্বাদ নেওয়া উচিত। এতে তার নিজস্ব দক্ষতা বাড়ে বলেই আমার বিশ্বাস। আমিও উইচার অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি, জেনেছি, বুঝেছি।

জিজ্ঞেস করতে পারেন, বইটা অনুবাদ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুগেছেন কী নিয়ে? উত্তরটা হলো: গদ্যশৈলী। স্যাপকোভ্স্কির নামের মতোই তার ভাষাটাও মাঝে মাঝে কুটিল রূপ ধারণ করে। তখন প্রয়োজন হয় প্রচুর মনোযোগ আর ধৈর্য। আমি চেষ্টা করেছি লেখকের নিজস্ব স্টাইলকে বাংলায় রূপান্তর করতে, যেন অনুবাদ পড়ে মনে হয় তিনি নিজেই লিখেছেন। আর তাই কোনোকিছু বাদ না দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি একুরেসি ঠিক রাখার। আমার মনে হয় অনুবাদের ক্ষেত্রে একুরেসি বজায় রাখা এবং একই সাথে সাবলীলতা ধরে রাখা সবচেয়ে কঠিন কাজ। ব্যাপারটা এমন যে আপনি একুরেসির প্যারামিটারের কাঁটা উপরে নেবেন তো নিজ থেকেই সাবলীলতা কমে যাবে, আবার সাবলীলতা বাড়াতে গিয়ে নিজের খেয়ালখুশিমতো অনুবাদ করবেন তো একুরেসির প্যারামিটারের কাঁটাটা নিচের দিকে চলে যাবে। এখানে একটা ভারসাম্যপূর্ণ স্থান আছে, একটা অনুপাত আছে, যে অবস্থানে সর্বোচ্চ পরিমাণ একুরেসির পাশাপাশি সর্বোচ্চ পরিমাণে সাবলীলতা বজায় থাকে। আমার

কাছে ভালো অনুবাদ মানে হলো সেটা যেটায় একই সাথে এই দুটো প্যারামিটারের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। এই কারণেই একটা মাত্র অনুবাদে এত বেশি সময় নিয়েছি। এখন আপনাদের পড়ে ভালো লাগলেই আমার প্রকৃত প্রশান্তিটা আসবে।

যদি জিজ্ঞেস করেন, এই বইতে কোন গল্পটা অনুবাদ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে, বেশি সময় লেগেছে, তো এককথায় জবাবটা দেবো: *পৃথিবীর শেষ প্রান্তে*। না, এই গল্পটার গদ্যশৈলী এবং বর্ণনা অন্য গল্পগুলোর চেয়ে কঠিন না। সমস্যাটা হচ্ছে, মানুষের সাধারণ ভাষার বাইরে এই গল্পে আরো দুই ধরনের ভাষা আছে। একটা হলো গ্রাম্য ভাষা, আরেকটা আদি মানবদের ভাষা। সেকেন্ডারি ওয়ার্ল্ড ফ্যান্টাসির ক্ষেত্রে ইংরেজিতে গ্রাম্য ভাষা ফুটিয়ে তোলা তুলনামূলক সহজ; কারণ ওরা গ্রাম্য ভাষার এক বা একাধিক ধরন বহু আগেই বের করে ফেলেছে, যা ওদের হাই-এপিক ফ্যান্টাসিগুলোর সাথে মানায়। অন্যদিকে, আমরা মাত্র কয়েক বছর হলো হাই-এপিক ফ্যান্টাসির চর্চা করছি। হাই-এপিকের বর্ণনা আর কথোপকথনের মূল ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই সংগ্রাম করতে হচ্ছে আমাদের, সেখানে গ্রাম্য ভাষা! ব্যাপারটা আসলে অত সহজ না। প্রাইমারি ওয়ার্ল্ডে লেখা ফ্যান্টাসিতে আমরা বাংলাদেশের যে অঞ্চলের ভাষা মন চায় দিতে পারি, মানিয়েও যাবে, কিন্তু হাই-এপিকের সেটিংস সাধারণত মধ্যযুগীয় পরিবেশে হয়, ফলে সেখানে নোয়াখালির ভাষা, কুমিল্লার ভাষা হুবহু তুলে দিলে মানাবে না।

কারণটা আসলে মনস্তাত্ত্বিক, আর কিছু না। শব্দের আসলে নিজস্ব কোনো অর্থ নেই; এ কেবলই কিছু ধ্বনির সমষ্টি। আমরাই শব্দদেহে অর্থের সঞ্চার করি। এই অর্থ থেকে সৃষ্টি হয় ভাবের, আর সেই ভাবের প্রভাবে প্রতিটা শব্দই পুঞ্জীভূত হয় স্মৃতির একেকটা বুদবুদের মাঝে। সেই বুদবুদ আমাদের কানে এসে ফেটে যায়; শব্দ চলে যায় কানে আর স্মৃতি চলে যায় ব্রেইনে। ফলে নির্দিষ্ট শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট স্মৃতি উসকে যায়, উৎপত্তি হয় নির্দিষ্ট ভাবের। আর এ কারণেই সেকেন্ডারি ওয়ার্ল্ডে নোয়াখালির ভাষা কানে গেলে আপনার মনে হবে, এই জগতে নোয়াখালি কোত্থেকে আসলো, ভাই! এ না সম্পূর্ণ আলাদা এক জগত?

তাই আলাদা জগতের আলাদা অনুভূতি জাগাতে হলে সেকেন্ডারি ওয়ার্ল্ডের জন্য আলাদা আঞ্চলিক/কথ্য/গ্রাম্য ভাষা বের করতে হবে। আর সেজন্যই এই গল্পে দুটো ভাষা তৈরি করতে হয়েছে আমাকে–বর্তমান গ্রাম্য ভাষা আর আদি মানবদের ভাষা। তার জন্য তৈরি করতে হয়েছে একাধিক চার্ট। কোন ক্রিয়াপদের রূপ কেমন হবে, সর্বনামের রূপ কেমন হবে, অনুসর্গের প্রকৃতি কেমন হবে, কোন বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকবে আর কোনগুলো পরিবর্তিত হবে তা বের করতে হয়েছে।

এসবের বাইরে সাধারণ শব্দগুলোর গ্রাম্য আর আদি সংস্করণ বের করতে হয়েছে। কাজটা করতে গিয়ে কয়েকবার মনে হয়েছে, থাক বাদ দেই, সাধারণ ভাষাতেই লিখে দেই। কে এত খতিয়ে দেখে? কিন্তু সে উপায়ও ছিলো না; কারণ বর্ণনাতেই স্পষ্ট বলা আছে, গ্রামবাসীদের মুখের ভাষা শুনে ইয়াস্কিয়ার একটু পরপর হাসিতে ফেটে পড়ছে, সেই সাথে গেরাল্ট এবং ইয়াস্কিয়ার নিজেরাই ভুল করে ঐ ভাষায় কথা বলে পরস্পরকে আবার খোঁচাও দিচ্ছে, 'সাবধান, ভাষাটা কিন্তু ভীষণ ছোঁয়াচে।' তাই হয় আমাকে নতুন ভাষা তৈরি করতে হতো, নইলে পাঠকদের সাথে প্রতারণা করতে হতো। আর পাঠকদের সাথে প্রতারণা করা আমার কখনোই পছন্দ না।

এই ভাষা তৈরির সময় যে সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি পোহাতে হয়েছে তা হলো, একটা শব্দে যদি পরিবর্তন আনি, তার টানে আরেকটা শব্দে পরিবর্তন আনতে হয়েছে, তার টানে আরেকটা, সেটার টানে আবার আরেকটা...(নইলে এক্সেন্ট একরকম থাকবে না)। এই একটা ব্যাপারই রাতের পর রাত দুঃস্বপ্ন উপহার দিয়েছে আমাকে। এরপর অবশেষে যখন ভাষা দুটোর পরিপূর্ণ রূপ পেলাম, অডিও বুকের মতো করে ভয়েস রেকর্ড করে নিজেই অনেকবার শুনলাম, ভাষার অলিগলিতে ঘুরে বেড়ালাম। পরিচিতদের পড়ালাম, অডিও রেকর্ডগুলোও শোনালাম। তারা বেশ পছন্দ করলো। আমিও ভাষাগঠনে তুলির শেষ আঁচড় দিতে পারলাম। আর এই ভাষা দুটো গঠনে মতামত দিয়ে অসামান্য সাহায্য করার জন্য জুলিয়ান, জুঁথী, সুজানা আর রবিন ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সর্বশেষ যে ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর খাটতে হয়েছে তা হলো টার্ম। আমার মনে হয় আমরা আমাদের ফ্যান্টাসি সাহিত্যের প্রথম পর্যায় শেষ করে ফেলেছি, এখন দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে অনেক টার্ম আমরা ঠিকভাবে বাংলায় ব্যবহার করতে পারিনি হয়তো–যেমন স্পেল, চার্ম, উইজার্ড, কোট অব আর্মস ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পাঠকদের ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করার ব্যাপার থাকে। হুট করেই সব একত্রে বাংলাকরণ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। যেকোনো জায়গায় পরিবর্তন আনার জন্য সময় দিতে হয়, দীর্ঘদিন ধরে তার পিছে লেগে থাকতে হয়। ধৈর্যহীনতা হতাশা ডেকে আনে, সফলতা নয়। এখন আমার মনে হয়, এই টার্মগুলোর বাংলাকরণ করার সময় এসেছে। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে অন্য বইতেও প্রায় একই টার্ম ব্যবহার করবো, যাতে শব্দগুলো শুনতে শুনতে একটা সময় স্বাভাবিক হয়ে আসে। প্রয়োগগুলো বইতেই দেখে নেবেন, আর কাহিনির মাধ্যমে বুঝে নেবেন কোনটার সাথে কোনটার পার্থক্য কী। শব্দগুলো বাংলা ভাষা থেকেই এসেছে, তাই আশা করি দ্রুতই মানিয়ে নিতে পারবেন।

বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোর মাঝে একটা হলো ইয়াস্কিয়ার। তার নাম নিয়ে অবশ্যই বলা উচিত। মূল বইটা পোলিশ ভাষায় লেখা, আর তাতে আমাদের সবার প্রিয় এই কবির নাম এটাই। ইংরেজি অনুবাদে নামটা পরিবর্তন করে *ড্যান্ডালায়ন* করা হয়েছে। আমি ইয়াস্কিয়ারই রেখেছি, এমনকি নেটফ্লিক্সও *দ্য উইচার* সিরিজে নাম এটাই রেখেছে। এদিকে, চরিত্রের নামের বাইরেও লেখকের নাম নিয়ে ভালোই ভুগতে হয়েছে। বলে রাখা দরকার, পোলিশ ভাষায় W-এর উচ্চারণ V-এর মতো। তাই স্যাপকোওস্কি না লিখে স্যাপকোভ্স্কি লিখেছি (যদিও ইংরেজরা স্যাপকাওস্কি বলে)। হসন্তটা দিতেই হলো, নইলে কো-ভস্কি উচ্চারণ করে বসবেন।

যাই হোক, আমার চার বছরের প্রচেষ্টার ফল *দ্য লাস্ট উইশ* অবশেষে বের হচ্ছে, আমি এতেই খুশি। হয়তো খুশির তীব্রতায় অনেক বেশিই কথা বলে ফেলেছি। তবে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিটা আসবে পাঠ-প্রতিক্রিয়া দেখার পর।

আশরাফুল সুমন
অনুবাদক

বিবেকের ধ্বনি

১

ভোরের দিকে ওর কাছে এলো সে।

খুব সাবধানে ভেতরে ঢুকলো মেয়েটা, নিঃশব্দে চলাফেরা করছে, কক্ষের ভেতর ভাসছে অশরীরীর মতো। একমাত্র শব্দ বলতে তার ঢোলাঢালা জামার শরীরের সাথে ঘর্ষণের শব্দ। এই মৃদু শব্দেও জেগে উঠলো উইচার। অথবা বলা যায়, যে আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে একঘেয়েভাবে ভাসছিলো, তার থেকে এই শব্দ ওকে টেনে তুলেছে। ওর মনে হচ্ছিলো যেন এতক্ষণ ধরে সমুদ্রতল আর সমুদ্রপৃষ্ঠের মাঝের অন্তহীন পথ ধরে পড়ছিলো সে। আর সেই পতনের পুরোটা সময় জুড়েই ওর চারপাশে ধীরে-সুস্থে দুলছিলো সামুদ্রিক শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ।

জেগে ওঠার পরেও নড়েনি সে, একপাশে ঘোরেনি। এদিকে মেয়েটা ভাসতে ভাসতে আরো কাছে এগিয়ে এলো। গায়ের ঢোলা জামাটা ছুঁড়ে ফেলে বেশ ধীরে আর দ্বিধার সাথে হাঁটুটা ছোঁয়ালো বিশাল বিছানার প্রান্তে। অর্ধনিমীলিত চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে মেয়েটাকে দেখছে সে, কিন্তু ও যে জেগে গেছে তা প্রকাশ করছে না। সাবধানে বিছানার উপর উঠে এলো মেয়েটা, ওর গায়ের উপর উঠে নিজের হাঁটু দিয়ে শরীরটাকে চেপে ধরলো। হাতের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে এসে চুল দিয়ে ছুঁয়ে দিলো উইচারের মুখ। ঐ চুলে ক্যামোমায়েলের সুগন্ধ। দৃঢ়চিত্তে এবং বেশ অস্থিরভাবে আরো ঝুঁকে স্তনযুগল দিয়ে উইচারের চোখের পাতা, চিবুক আর ঠোঁট ছুঁয়ে দিলো মেয়েটা। খুব ধীরে আর নরমভাবে হাসলো উইচার। মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরতেই সে সোজা হয়ে ওর আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল। উষার ধোঁয়াশাচ্ছন্ন প্রভায় ওকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। নড়ার চেষ্টা করলো উইচার, তবে দুই হাতের চাপে ওকে নড়তে নিষেধ করলো মেয়েটা। তারপর কোমরের হালকা দোলায় ওর কাছ থেকে জবাব চাইলো।

জবাব দিলো উইচার। মেয়েটা এখন আর ওর হাত গলে বেরিয়ে যাচ্ছে না, উলটো মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চুলে ঝাঁকি দিচ্ছে। ওর চামড়া বেশ ঠান্ডা আর অদ্ভুত রকমের কোমল। মেয়েটার চোখদুটো যখন ওর মুখের কাছে এলো, তখন ওগুলোকে এই প্রথমবার দেখতে পেল সে। বড় বড় চোখদুটো জলে বাস করা নিক্ষের মতোই কালো।

আর তারপর ক্যামোমায়েলের সমুদ্রে হারিয়ে গেল সে। ঐ সমুদ্রটা বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন ফুটছে টগবগ করে।

উইচার

১

অনেক পরে জানা যায়, লোকটা এসেছিলো উত্তর দিকের ঐ দড়াবাজদের গেট দিয়ে। ক্লান্ত ঘোড়াটাকে টেনে টেনে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছিলো। তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে, আশেপাশের সমস্ত দড়াবাজ, জিননির্মাতা আর চর্মকারদের দোকানপাটও বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট ছিলো পুরো ফাঁকা। খুব গরম পড়েছিলো সেদিন, তারপরেও একটা কালো রঙের কোট পরে ছিলো লোকটা।

ওল্ড নারাকোর্ট নামক সরাইখানার সামনে এসে থামলো সে, খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে চারপাশের গুঞ্জন শুনলো। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও জায়গাটা ছিলো লোকে লোকারণ্য। ভেতরে না গিয়ে ঘোড়াটাকে টেনে ফক্স নামের পানশালার সামনে চলে এলো সে। আগেরটার চেয়ে তুলনামূলক ছোট, আর খুব একটা জনপ্রিয় না হওয়ায় ভেতরটা প্রায় জনশূন্য।

জারিত শসার পিপের উপর দিয়ে মুখ তুলে ওকে মাপতে শুরু করলো পানশালার মালিক। আগন্তুক ততক্ষণে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জড়ো বস্তুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা এখনো তার কোট খোলেনি।

‘কী খাবেন?’

‘বিয়ার,’ আগন্তুক বললো। ওর গলার স্বর ততটা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

নিজের ক্যানভাস অ্যাপ্রোনে হাত মুছে নিয়ে একটা বড়, ভাঙাচোরা মাটির গ্লাস মদে পূর্ণ করে দিলো পানশালার মালিক।

আগন্তুক বয়স্ক না হলেও ওর চুলগুলো প্রায় পুরোপুরি সাদা। কোটের ভেতরে চামড়ার তৈরি রংচটা একটা ফতুয়া দেখা যাচ্ছে, যেটা ঘাড় আর কাঁধের কাছে বাঁধা। কোট খুলে ফেলার পর ওর সাথে থাকা তলোয়ারটা সবাই দেখতে পেল। ব্যাপারটা অবশ্য ভিজিমে অস্বাভাবিক নয়; এখানকার প্রায় সব লোকের কাছেই অস্ত্র আছে। কিন্তু কেউই ওর মতো করে ধনুক বা তূণীরের ন্যায় পিঠে তলোয়ার বহন করে না।

অন্য সব অতিথির সাথে টেবিলে বসলো না সে। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বড় গ্লাসটা থেকে মদ পান করে যাচ্ছে, সেই সাথে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পানশালার মালিকের দিকে।

'আমার আজ রাতের জন্য রুম দরকার।'

'হবে না,' কর্কশভাবে জবাব দিলো লোকটা। ওর চোখ ঘুরছে আগন্তুকের ধুলো-ময়লামাখা বুটের দিকে। 'ওল্ড নারাকোর্টে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'আমার এখানেই দরকার।'

'বলেছি তো হবে না।' পানশালার মালিক অবশেষে ওর বাচনভঙ্গি ধরতে পারলো। লোকটা রিভিয়ান।

'আমি খরচ দেবো,' নিচু স্বরে বললো আগন্তুক, যেন এই ব্যাপারে ও নিজেই নিশ্চিত না এখনো।

আর তারপরেই একযোগে শুরু হয়ে গেল সবকিছু। ও এখানে প্রবেশ করার পর থেকেই সারা মুখে দাগবিশিষ্ট একটা লোক ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। এই মুহূর্তে সে কাউন্টারের দিকেই তেড়ে আসছে। ওর পেছনে উঠে দাঁড়িয়েছে আরো দুইজন সঙ্গী।

'এখানে কোনো রুম নেই, রিভিয়ান ভ্যাগাবন্ড!' লোকটা অসভ্যের মতো বললো। আগন্তুকের একদম মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'ভিজিমের মতো শান্ত শহরে তোর মতো লোকদের দরকার নেই।'

আগন্তুক ওর হাতের গ্লাস নিয়ে সরে গেল। তবে যাওয়ার আগে পানশালার মালিকের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়েছিলো লোকটা। মালিক অবশ্য সাথে সাথে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। রিভিয়ানটার পক্ষে কথা বলার কোনো দরকার দেখছে না সে। এদেরকে পছন্দ করে কে?

'সমস্ত রিভিয়ান চোর,' গুন্ডা প্রকৃতির লোকটা বলে চলেছে। ওর নিঃশ্বাসের সাথে বেরোচ্ছে মদ আর রসুনের গন্ধ। আর ক্রোধ। 'তুই আমার কথা শুনতে পেয়েছিস, বেজন্মা?'

'ও তোর কথা শুনবে না। কারণ ওর কান ময়লায় ভরে আছে,' গুন্ডাটার সাথে থাকা দুই সঙ্গীর একজন বললো। কথাটা শুনে পাশেরজন হেসে উঠলো হোহো করে।

'দাম পরিশোধ করে ভাগ!' দাগওয়ালা লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো।

অবশেষে ঘুরে তাকালো রিভিয়ান আগন্তুক। 'বিয়ার শেষ না করে কোথাও যাচ্ছি না।'

'আয়, তোকে বাইরে যেতে সাহায্য করছি,' হিসিয়ে উঠলো দাগওয়ালা লোকটা। ওর হাত থেকে মদের গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। একই সাথে

ওর কাঁধ চেপে ধরে ওখান থেকে কোনাকুনিভাবে বুক পর্যন্ত চলে যাওয়া চামড়ার ফালির ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিলো। তার দুই সঙ্গীর একজন ঘুসি মারার জন্য মাত্র হাতটা পাকিয়েছে।

ভয়াবহ তীব্রতার সাথে ঘুরলো আগন্তুক। ওর শরীরের ঝটকায় গুন্ডা প্রকৃতির লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। হিসহিস করতে করতে খাপ থেকে বেরিয়ে এলো ওর তলোয়ার। এই ক্ষীণ আলোতেও চকচক করছে ওটা। পুরো পানশালাই যেন উত্তপ্ত হয়ে আছে এই মুহূর্তে। চিৎকার করতে করতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকজন। ঠক করে মেঝেতে পড়ে গেল একটা চেয়ার। মাটির তৈরি জিনিসপত্র নিচে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে। পানশালার মালিকের ঠোঁট কাঁপছে। তার ভয়ার্ত চোখের সামনে মুখে বিশাল এক কাটা দাগ নিয়ে কাউন্টারের সামনে থেকে পিছলে পড়ে গেল দাগওয়ালা লোকটা। বাকি দুইজনের একজন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। অপরজন চটচটে তরল পদার্থের ভেতর শুয়ে আছে, কাঁপছে মৃগী রোগীর মতো। কোনো এক মহিলার উত্তেজিত চিৎকার বাতাসকে চিরে দিলো, আর সাথে সাথে বমি করে দিলো পানশালার মালিক।

দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আগন্তুক, সতর্ক চোখে দেখছে সবাইকে, দুই হাতে তলোয়ারটা ধরে ঘোরাচ্ছে মধ্যাকাশে। আশেপাশে থাকা কেউই নড়তে পারছে না। ঠান্ডা মাটি মুখে লেগে থাকলে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, ঠিক তেমনি ভয়ও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের মুখে। এই ভয় ওদের হাত-পা অসাড় করে রেখেছে, এমনকি চেপে ধরেছে গলাকেও।

হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ঢুকলো তিনজন রক্ষী–নির্ঘাত আশেপাশেই ছিলো। প্রত্যেকের সাথেই আছে চামড়ার ফালিতে বাঁধা ছোটখাটো লাঠি, তবে সেদিকে হাত না বাড়িয়ে লাশগুলো নজরে আসামাত্রই তলোয়ার তুললো ওরা। দেয়ালে পিঠ ঠেকালো আগন্তুক, বাম হাত দিয়ে নিজের বুটের ভেতর থেকে বের করে আনলো লুকোনো একটা ছোরা।

'অস্ত্র ফেলে দাও!' কম্পিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো এক রক্ষী। 'ফেলে দাও বলছি! তুমি এখন আমাদের সাথে যাবে, বুঝেছ?'

দ্বিতীয় রক্ষীটা লাথি মেরে একটা টেবিল ফেলে দিলো, যেটা এখন পড়ে আছে ওর আর আগন্তুকের মাঝখানে। 'ট্রেস্কা, সবাইকে ডাকো, এক্ষুনি!' চিৎকার করে তৃতীয় রক্ষীটাকে বললো সে। ঐ রক্ষীটা এখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'প্রয়োজন নেই,' আগন্তুক বললো, নিজের তলোয়ার নামিয়ে নিয়েছে। 'আমি যাবো তোমাদের সাথে।'

'অবশ্যই যাবে, তবে ফাঁসির মঞ্চে, বুঝলে?' রক্ষীটা কাঁপতে কাঁপতে বললো। 'তলোয়ার ফেলে দাও, নইলে তোমার মাথাটাই ফেলে দেবো।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো রিভিয়ান। চোখের পলকে বাম বাহুর নিচে গুঁজে ফেললো নিজের তলোয়ার, তারপর ডান হাতের সাহায্যে শূন্যে একটা জটিল প্রতীক আঁকলো। ওর টিউনিকের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত গেঁথে থাকা পেরেকগুলো ঝলসে উঠলো তীব্র আলোয়।

পিছিয়ে গেল রক্ষীরা, এই মুহূর্তে চোখের সামনে হাত দিয়ে রেখেছে। অতিথিদের ভেতর একজন দরজা দিয়ে পালাচ্ছে, আরেকজন লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেছে। মহিলাটা আবারো চিৎকার করে উঠলো, এবার আরো জোরে।

'আমি নিজেই তোমাদের সাথে আসবো,' আগন্তুক নিজের ভারী, ধাতব কণ্ঠে বললো। 'তোমরা তিনজন আমার সামনে সামনে যাবে। দুর্গপ্রধানের কাছে নিয়ে চলো আমাকে। রাস্তা চিনি না আমি।'

'জি, স্যার,' বিড়বিড় করে বললো রক্ষীটা, মাথা নিচু করে রেখেছে। দরজার কাছে গিয়ে অনিশ্চিতভাবে আশেপাশে দেখতে থাকলো। অন্য দুইজন তড়িঘড়ি করে পিছু নিলো ওর। আগন্তুকও ওদের পেছনেই যাচ্ছে, ততক্ষণে তলোয়ার আর ছোরা যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। ও টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাকি অভ্যাগতরা চেষ্টা করলো এই ভয়ংকর আগন্তুকের কাছ থেকে নিজেদের মুখ লুকোনোর।

২

ভিজিমের দুর্গপ্রধান ভেলেরাড নিজের থুতনি চুলকাচ্ছে। সে ভীতুও না আবার কুসংস্কারেও বিশ্বাসী না, কিন্তু তারপরেও এই সাদা চুলের লোকটার সাথে একাকী থাকার একদম ইচ্ছা নেই তার। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর অবশেষে নিজের সিদ্ধান্ত নিলো সে।

'তোমরা যাও এখান থেকে,' রক্ষীদের আদেশ দিলো ভেলেরাড। 'আর তুমি, বসো। না, এত কাছে না, আরো দূরে।'

আগন্তুক বসলো। ওর সাথে এই মুহূর্তে সেই তলোয়ার বা কালো কোটটা নেই।

'আমি ভেলেরাড, ভিজিমের দুর্গপ্রধান,' টেবিলে থাকা ভারী গদাটা দোলাতে দোলাতে বললো সে। 'তোমার কী বলার আছে শুনবো আমি। তোমাকে অন্ধকূপে ছুঁড়ে দেওয়ার আগে কী কী বলার আছে বলো। তিনটা খুন আর একটা মায়া প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলে তুমি। ভিজিমে এই ধরনের কাজের জন্য মানুষকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দেই। কিন্তু আমি ন্যায়বিচারক, তাই তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে তোমার কথাগুলো শুনবো। বলো।'

পোশাকের ভেতর থেকে সাদা রঙের একদলা ছাগলের চামড়া বের করলো রিভিয়ান। 'বেশ দূরবর্তী কিছু সরাইখানায় আপনারা এই বার্তাগুলো আটকে রেখেছেন। এখানে যা লেখা আছে তা সত্য?'

'ওহ।' চামড়ার উপর থাকা রুনগুলোর দিকে নজর দিলো ভেলেরাড। 'তাহলে এই হলো ব্যাপার। অথচ একবারের জন্যেও বিষয়টা মাথায় আসেনি আমার। হ্যাঁ, অবশ্যই সত্য। এখানে টেমেরিয়া, পন্টার আর মাহাকামের রাজা ফল্টেস্টের স্বাক্ষর আছে। অতএব, এখানে যা লেখা আছে তার সবই সত্য, উইচার। বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপনই, তাই না? কিন্তু এরপরেও...আইন বলেও তো কিছু একটা আছে, নাকি? আমি ভিজিমের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে আছি। আর এখানে কোনো খুনখারাবি সহ্য করবো না আমি। বুঝতে পেরেছ?'

রিভিয়ান লোকটা মাথা নাড়লো, যেটা দেখে আরো রেগে গেল ভেলেরাড।

'তোমার কাছে কি উইচারদের প্রতীক আছে?' দুর্গপ্রধান জানতে চাইলো।

জামার ভেতর থেকে একটা রুপালি চেইন বের করে ভেলেরাডের সামনে ধরলো আগন্তুক। চেইনের শেষ প্রান্তে একটা গোল মেডালিয়ন দেখা যাচ্ছে, যেখানে খোদাই করা আছে শ্বদন্ত বের করে রাখা একটা নেকড়ের মাথা।

'তোমার নাম? যেকোনো নাম বললেই চলবে। কেবল কথাবার্তার সুবিধার জন্য জানতে চাইছি।'

'আমার নাম গেরাল্ট।'

'গেরাল্ট। রিভিয়ান, তাই না? উচ্চারণ শুনে তাই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমি রিভিয়া থেকে এসেছি।'

'এবার কাজের কথায় আসি। এই যে প্রচারপত্রটা দেখছো–' চামড়াটার উপর হাত দিয়ে চাপড় মারলো সে–'এর কথা ভুলে যাও। এটা খুব বেশিই ভয়ংকর। এর আগে অনেকেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়েছে। শোনো, বন্ধু, এ সামান্য কয়টা গুন্ডার সাথে যুদ্ধ করার মতো সাধারণ ব্যাপার না।'

'জানি আমি। আর এটাই আমার কাজ, ভেলেরাড। এই প্রচারপত্র অনুযায়ী, কাজ শেষে তিন হাজার ওরেন দেওয়ার কথা।'

'তিন হাজার, হ্যাঁ।' চোখ পাকালো ভেলেরাড। 'সেই সাথে গুজব অনুযায়ী, রাজার মেয়ের সাথে বিয়ে...যদিও এই ধরনের কোনো ওয়াদাই ফল্টেস্ট করেনি।'

'রাজকন্যার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই,' শান্তভাবে বললো গেরাল্ট। একেবারে স্থির হয়ে হাঁটুর উপর হাত রেখে বসে আছে সে। 'কেবল ঐ তিন হাজার ওরেনের উপর আছে।'

'কী সময় এলো...' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভেলেরাড। 'কী এক জঘন্য সময় এলো! বিশ বছর আগেও কেউ কখনো ভেবেছিলো যে উইচারের মতোও একটা পেশা থাকতে পারে? ভবঘুরে উইচার, যারা কিনা বাসিলিস্ক, ড্রাগন আর ভদনিকদের সহজেই হত্যা করতে পারে! গেরাল্ট, তোমাদের সংঘে কি মদ খাওয়া যায়?'

'অবশ্যই যায়।'

হাততালি দিলো ভেলেরাড।

'বিয়ার!' ও বললো। 'আরো কাছে এসে বসো, গেরাল্ট। কোনো সমস্যা নেই।'

খানিক বাদে দুইজনকেই ফেনা-ওঠা, শীতল বিয়ারে চুমুক দিতে দেখা গেল।

'খুবই বাজে সময় চলছে,' হাতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছে ভেলেরাড। 'সব ধরনের নোংরা জানোয়ার যেন হুট করেই জেগে উঠেছে। মাহাকামের পাহাড় বোগিম্যানে ভরে গেছে। আগে বন থেকে শুধু নেকড়ের গর্জনই ভেসে আসতো, কিন্তু এখন কবোলড, স্প্রিগ্যান, ওয়্যারউলফ, নইলে অন্য কোনো নোংরা জানোয়ারের হুংকারই বেশি শোনা যায়। পরী আর রুসালকাগুলো গ্রামে হানা দিয়ে ছোট বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যায়। এমন কিছু রোগের জন্ম হয়েছে যেগুলোর কথা আগে কখনো শোনা যায়নি, যেগুলোর কথা শুনলে আমার সমস্ত চুল দাঁড়িয়ে যায়। আর সবকিছুর উপরে হচ্ছে, এই!' চামড়ার দলাটাকে টেবিলের অপর প্রান্তে পৌঁছে দিলো সে। 'আর এই কারণেই তোমাদের উইচারদের এত দাম আজকাল।'

'রাজার এই বিজ্ঞপ্তির কথা বলুন।' গেরাল্ট চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো। 'এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন?'

নিজের চেয়ারে হেলান দিলো ভেলেরাড, হাতদুটোকে পেটের উপর ভাঁজ করে রেখেছে।

'বিস্তারিত? অবশ্যই জানি। সরাসরি দেখিনি, তবে বিশ্বস্ত সূত্র থেকেই শুনেছি।'

'বলতে থাকুন।'

'তোমার যদি শোনার এতই ইচ্ছা থাকে, তবে শোনো,' বিয়ারে আরেকটা চুমুক দিয়ে গলাটা নিচু করে বলতে শুরু করলো সে। 'ফল্টেস্ট যখন রাজকুমার ছিলো, মানে রাজা মেডেলের সময়, তখনই দেখিয়েছে যে সে অনেক বড় কিছু করতে সক্ষম। আমরা আশা করছিলাম সে একসময় আরো বড় কিছু করবে। কিন্তু ওর রাজ্যাভিষেকের পরপরেই সে খুব বাজে একটা কাজ করলো। নিজের বোনের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে গেল, যার ফলে জন্ম নিলো একটি শিশু। আডা বয়সে ফল্টেস্টের ছোট ছিলো, আর ওদেরকে সব সময়ই একসাথে দেখা যেত। কারোই এইসব ব্যাপারে কোনো সন্দেহ হয়নি, শুধু ওদের মা ছাড়া। ব্যাপারটা এরকম যে হুট

করেই একদিন সবাই দেখলো আডা গর্ভবতী, আর তখন ফল্টেস্টও নিজেদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিয়ে ওকে বিয়ে করতে চাইলো। অবস্থা আরো খারাপ হলো কারণ নোভিগ্রাডের রাজা ভিজিমির চাইছিলেন ফল্টেস্টের সাথে তার মেয়ে ডালকার বিয়ে দিতে। তিনি ইতোমধ্যেই বিয়ের প্রস্তাবসহ বিশাল এক বহরও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওদেরকে অপমান করা থেকে ফল্টেস্টকে বিরত রাখতে হয়েছিলো আমাদের। ভাগ্যিস, আমরা সেটা করতে পেরেছিলাম, নইলে ভিজিমির আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতো। এরপর আডার সাহায্যে আমরা তাকে বিয়ের ব্যাপারে হুটহাট কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখলাম।

'আর তারপর আডা বাচ্চার জন্ম দিলো। এবার ভালো করে শোনো; কারণ পুরো কাহিনি এখান থেকেই শুরু হয়েছে। শুধু কয়েকজন দেখেছে যে সে কীসের জন্ম দিয়েছে। জিনিসটাকে দেখার পর একজন ধাত্রী টাওয়ারের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। আরেকজন এখনো পর্যন্ত পাগল হয়ে আছে। তাই আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের সেই রাজকীয় জারজ–আমাদের রাজকুমারী–দেখতে অতটা সুশ্রী ছিলো না। আর সে জন্মের পরপরেই মারা যায় বলে জানতাম আমরা। কারণ কারোই ওর নাড়িতে গিঁট দেওয়ার কথা মাথায় ছিলো না। আর আডাও জন্ম দেওয়ার পরপরেই মারা যায়।

'এরপর আবারো দৃশ্যপটে চলে এলো ফল্টেস্ট। জ্ঞানীরা বলেছিলো রাজকীয় জারজকে দূরের কোনো বনে পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলতে হবে। তার পরিবর্তে আমাদের মহামান্য রাজার নির্দেশ অনুযায়ী তার লাশ বহনকারী কফিনটাকে প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ একটা কক্ষে রাখা হয়।'

মাথা তুললো গেরাল্ট। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরো আগেই এই বিষয়ে কোনো প্রাজ্ঞকে পাঠানো উচিত ছিলো।'

'প্রাজ্ঞ বলতে কি ঐ তারার ছবিওয়ালা টুপি পরা এলফগুলোর কথা বলছো? অবশ্যই। কফিনের ভেতর কী আছে আর রাতের বেলা কী বেরিয়ে আসে, সেটা জানার পর এরকম দশজন প্রাজ্ঞ ছুটে এসেছিলো। যদিও ওর মৃত্যুর পরপরেই সবকিছু শুরু হয়নি। তার শেষকৃত্য করার পর সাত বছর পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিলো। তারপর এক পূর্ণিমার রাতে প্রাসাদ থেকে ভেসে এলো চিৎকারের ধ্বনি। তুমি অবশ্য বুঝতেই পারছো কী হয়েছে, যেহেতু এটা তোমার অভিজ্ঞতার জায়গা। আর বিজ্ঞাপনটাও তুমি পড়েছ। শিশুটা মারা যায়নি, বরং কফিনের ভেতরেই বড় হয়েছে এত দিন, পরিণত হয়েছে বিশ্রী, তীক্ষ্ণ দাঁতযুক্ত এক জানোয়ারে। সংক্ষেপে যাকে বলে, স্ট্রিগা। ভাগ্যিস, আমার মতো লাশগুলো দেখোনি তুমি। যদি দেখতে, তবে বাকি জীবন ভিজিম এড়িয়ে চলতে।'